Rs. 2.00
PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা
MONTHLY
মূল্য ঃ ২ টাকা
মাসিক
Vol : XII Issue : XII, 15th, March, 2023 ফাল্গুন, ১৪২৯, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

আমরা সতেরো অতিক্রম করে আঠারো বছরে পা দেব। কবি সুকান্তের কাছে আঠারো বছর বয়েসটাকে দুঃসহ মনে হয়েছিল কারণ সে যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার স্পর্ধা দেখাতে পারে। আমরা কিন্তু প্রথম বছরে থেকেই সেই স্পর্ধা দেখাচ্ছি।

২০০৫ সালের ১৩ মার্চ বিমল চ্যাটার্জী, হরিদাস মালাকারের মতো শ্রমিক আন্দোলনের লড়াকু নেতারা যখন এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন তখন তাঁদের চোখে ছিল দিন বদলের স্বপ্ন। প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল প্রবীণদের জন্য। সমাজ যখন প্রবীণদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব অস্বীকার করছিল, তখন বিমলদারা হা-হুতাশ না করে নিজেদের কাঁধেই সে দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন। মানসিকভাবে তাঁদের কাছে থাকার চেষ্টা করেছিলেন।

আমরা সে লক্ষ্যে আজও অবিচল। তাদের দেখানো পথেই আমরা চলেছি, আদর্শের সঙ্গে কখনও আপোস করিনি— এটাই আমাদের গর্ব। সেদিনের বিমলদা, হরিদাস মালাকার, রামরমণ ভট্টাচার্য সহ অনেক প্রতিষ্ঠাতা সদস্যই আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। আমরা কিন্তু তাদের ভুলিনি। এই দুঃসময়ে অন্ধকার দিনে তাঁরাই আমাদের পথপ্রদর্শক।

গত সতেরো বছর অনেক কিছু করা গেছে কিন্তু না করতে পারার সংখ্যাটাই বেশি। তবে আমরা হাল ছাড়িনি। মাত্র কয়েকদিন আগে এলাকার দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাঠসামগ্রী দেওয়ার মাধ্যমে প্রয়াত রামরমণ ভট্টাচার্যকে স্মরণ করেছি। আমাদের আগামী লক্ষ্য একটি বৃদ্ধাবাস স্থাপন। আশা করি, সকলের সহযোগিতায় সেটাও পূর্ণ হবে।

আমরা বিশ্বাস করি—

'পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'॥

মাতৃভাষা

জয়শ্রী গুপ্ত

যখন সবে জন্ম, তখন পরিচিত মুখ মা। তখন ক্রন্দনই ছিল প্রথম আওয়াজ বা ভাষা, যা শুনে মা ছুটে আসত বাছার কি হল জানতে, সময় বলত এটা বাছার ক্ষিদের কান্না। মা তার ক্ষুধা মেটাতো আর সঙ্গে থাকত নানা কথা। শিশু কিন্তু মন সহযোগে চেষ্টায় থাকত সেই কথা অনুসরণ করা এবং উচ্চারণ করার। এইভাবে সে অর্জন করতো নানা বিষয়ের ভাষা। এভাবেই সৃষ্টি হল ভাষার যা সবকিছু প্রকাশের। আর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষা মাতৃদ্বারা, তারই নাম মাতৃভাষা (যেটা আঞ্চলিক)। এই মাতৃভাষার গুরুত্ব হল অবলীলায় নিজেকে প্রকাশ করা, জানানো বা কথোপকথনে। এই আঞ্চলিক ভাষাই সকলকে সাবলীল করে।

আজ এই ভাষাই মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী করেছে। যার সুফল বিজ্ঞানের উন্নতি ও নানা প্রযুক্তি। এই ভাষাজ্ঞান ছাড়া সবই মূল্যহীন। ভাষার উন্নতি চলছে, চলবে।

মাতৃমঙ্গল

মৃণাল দত্ত

আমার স্বদেশে এখন বিশ্বমেলা
কত কত ভাষার যাদুকরী মোহে
ভুলেছি আমার মুখের ভাষা
ভাষা জননী বিমর্ষ
কপোতাক্ষ তীরে নিঃসঙ্গ নিবাস...
যারা রক্ত দিয়ে রঙীন করেছে
মায়ের লালিম চরণ
ওই অমৃত স্মৃতিই বুঝি মাতৃমঙ্গল!
জননীর কোলে হেসে খেলে
শিখেছি যে ভাষা সে আমার বঙ্গভাষা
অনাদরে অবহেলায় ভুলে থাকি
মিরজাফরী লালসায়।
জননী, ক্ষমা করো বিস্মৃত সন্তানে
ধামসা মাদলে দামামা বাজাও বক্ষে
এবার আপন রক্তে অর্ঘ সাজাবো।।

বেথুন চর্চা-র গুরুত্ব

মৃগেন গাঁতাইত

মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা অর্থাৎ মানবতাবাদ চিরকালীন। সব দেশে সব কালে মানবতাবাদী মানুষ ছিল এবং আছে। তারই মধ্যে কিছু মানুষের জীবন আমাদেরকে আকৃষ্ট করে এবং অনুপ্রাণিত করে, বিশেষত যখন শোষিত অত্যাচারিত মানুষের কল্যাণে সেই জীবনের কার্যধারা অতিবাহিত হয়।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে ভারতের পাঁচজন ডাক্তার (ডাঃ মদনমোহনলাল অটল, ডাঃ মোরেশ্বর রামচন্দ্র চোলকার, ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস, ডাঃ বিজয় কুমার বসু এবং ডাঃ দেবেশ মুখোপাধ্যায়) জাপানী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে বিধ্বস্ত চিনা জনগণকে সাহায্য করতে চিনে গিয়েছিলেন ১৯৩৮ সালে। বিদেশি আরো কিছু মানুষ চিনের সংগ্রামে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। তেমনি স্পেনে ফ্যাসিবাদের অত্যাচারে জর্জরিত জনগণকে সাহায্য করতে অনেক বিদেশিদের মধ্যে ভারতের ডাঃ অটল, কানাডার ডাঃ নর্মান বেথুন গিয়েছিলেন। পরে বেথুন চিনে গিয়েছিলেন সংগ্রামী চিনা জনগণকে সাহায্য করতে। সেখানেই কর্মরত অবস্থায় বেথুনের মৃত্যু হয় ১৯৩৯ সালের ১২ নভেম্বর। অন্য মানুষকে সাহায্য করতে নিজের প্রাণ দেওয়ার ঘটনা আমাদের নাড়িয়ে দেয়, আবার অনুপ্রাণিত করে। ভারতের ডাঃ কোটনিসও চিনের কর্মক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন ১৯৪২ সালের ৯ ডিসেম্বর।

সাধারণ মানুষের মধ্যে সব সময়েই সদগুণের অস্তিত্ব আছে। সেই গুণকে আরও বিকশিত করে তোলে উন্নত জীবনের চর্চা। মাটিতে জল থাকলেও যেমন গাছে জল দিয়ে পরিচর্যা করতে হয়, তেমনি সৎ জীবনের চর্চা মনকে বিকশিত করে।

মানুষের অসুস্থতার মূল কারণ যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিহিত আছে তা উপলব্ধি করে তাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ডাঃ বেথুন। মানুষের শরীরের চিকিৎসক হিসাবে তিনি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার ব্যাধির মূল দিকটি সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করে গেছেন। তাই বেথুনের জীবন এবং কাজ নিয়ে আমাদের চর্চা চালিয়ে যেতেই হবে। কারণ, সমাজব্যবস্থার মধ্যে ধনবাদী অর্থলোলুপতা বা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অত্যাচারের ধারা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বারবার ঘষলে যেমন অস্ত্রের ধার বাড়ে, তেমনি বারংবার সৎ চিন্তা আলোচনার মাধ্যমে মনের বিকাশ হয়।

১ এপ্রিল থেকে ২০২২ - ২০২৩ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমাদের ঈশ্বর নেই

গৌতম রায়চৌধুরী

১২৯৮ সালের ১৩ শ্রাবণ রাত দুটো আঠোরো মিনিটে (২৯ জুলাই ১৮৯১) ঈশ্বরের মৃত্যু হয়। পরের দিন সকালে নিমতলা ঘাটে চন্দনকাঠের চিতায় শবদাহ হয়। শ্মশানঘাটে প্রচুর ভীড় হয়েছিল। অনেক মহিলাও ছিলেন। এদের মধ্যেই ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট মহিলা কবি মানকুমারি বসু (১৮৬৩-১৯৪৩)। গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের মৃতদেহ দেখে তিনি সেদিনই 'শোকোচ্ছ্বাস' নামে এক অসামান্য গদ্য রচনা করেন।

> 'অই জাহ্নবী-বক্ষে ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে। ঐ আগুনে বাংলার সর্বনাশ হইতেছে। বাঙ্গালীর পিরামিড ভস্মসাৎ হইতেছে। ..... ঐ চিতার আগুনে আজ রাত কি ফুরাইল! কত কাঙাল গরীব মাতা-পিতা হারাইল। কত হৃদয় আছি আশা-ভরসা-হারা হইল।'

[বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল সরকার, পৃ. ৩৭১]

ক্রমে এই শোকসংবাদ কলকাতা শহর তথা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। ভারতের সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছিল। এলাহাবাদের পাইওনিয়র (২৯ জুলাই ১৮৯১), কলকাতার ইংলিশম্যান (৩০ জুলাই, ১৮৯১), ডেলি নিউস (৩০ জুলাই, ১৮৯১), স্টেটসম্যান (২৯ জুলাই, ১৮৯১) ছাড়াও ইংল্যান্ড-আমেরিকার বহু পত্র-পত্রিকায় খবর প্রচারিত হয়েছিল। প্রতিটি বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে যেমন শোকসংবাদ প্রচারিত হয়েছিল, তেমনি মুদ্রিত হয়েছিল তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ-কবিতা।

> 'বিদ্যাসাগর নাই— নববর্ষের প্রারম্ভেই 'অনুসন্ধান'কে আজ এই নিদারুণ শোকসংবাদ মুখে করিয়া বাহির হইতে হইল। গত পরশ্য, ১৩ই শ্রাবণ রাত্রি ২টা ২২ মিনিটের সময়, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র ঈশ্বরস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন।'

['অনুসন্ধান', ২৫, সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ১২৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২৬। পৃ. ৪৪৫]

> 'শহর-মফঃস্বলের বেসরকারী স্কুল-কলেজ বন্ধ হইয়াছিল। কলিকাতার মেট্রোপলিটানের ছাত্রগণ পাদুকা পরিত্যাগ করিয়াছিল। কলিকাতার পুস্তক বিক্রেতাগণ, কোম্পানির কাগজের দালালগণ ও রাজাবাজারের দোকানদারগণ দোকানপাট ও অফিসাদি বন্ধ করিয়াছিলেন। মেট্রোপলিটান, প্রেসিডেন্সি, সংস্কৃত কলেজ, হাওড়া স্কুল প্রভৃতি স্থানে শোক-প্রকাশের জন্য সভা হইয়াছিল। .....এতদ্ভিন্ন, কত স্থানে কত সভাসমিতিতে যে আহুত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। মফস্বলে বর্ধমান, হুগলী, শ্রীরামপুর, ঢাকা, আসাম-গৌহাটি, বরিশাল, ত্রিপুরা, কুচবিহার প্রভৃতি ছোট বড় শহরে এবং অন্যত্র হায়দারাবাদে পর্যন্ত নানা স্থানে শোকপ্রকাশ ও স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিবার উদ্দেশে সভাসমিতি হইয়াছিল। .....ঢাকার সভায় ভাওয়ালাধিপতি রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ বাহাদুর বিদ্যাসাগরের স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে ঢাকা কলেজে তিন সহস্র টাকা দিবার প্রস্তাব করেন।'

[বিদ্যাসাগর। বিহারীলাল সরকার। পৃ. ৩৭৩]

সংবাদ-সাময়িকপত্র ছাড়াও বেশ কিছু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় হ্যান্ডবিল হিসাবে বিলি করা হয়েছিল শতাধিক শোককবিতা। লেখকদের অধিকাংশই বিদ্যালয়ের ছাত্র হলেও সেকালের বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান কবিও ছিলেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ছিলেন বিদ্যাসাগরের

ঘনিষ্ঠ। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। দুঃসংবাদ পেয়েই তিনি 'বিদ্যাসাগর' নামে ৭ স্তবকের একটি কবিতা লিখলেন এবং হ্যান্ডবিল হিসাবে ছাপিয়ে সেটা বিতরণের ব্যবস্থা করলেন।

'ফুরাল বঙ্গের লীলা-মাহাত্ম্য সকলি,—
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী।
হারালে মা বঙ্গভূমি, পুত্ররত্নে আজ,
বিশীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ।'

[বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

জীবনীকার বিহারীলাল সরকার জানিয়েছেন হেমচন্দ্র ছাড়া রাজকৃষ্ণ রায় এবং ভূপেন্দ্রবালা দেবীর লেখা মোট তিনটি কবিতা হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সমকালের বিশিষ্ট মাসিক পত্র নব্যভারত ৪৪ পৃষ্ঠার 'বিদ্যাসাগর সংখ্যা' (ভাদ্র, ১২৯৮) প্রকাশ করেন। কোনও ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই প্রথম। বিশিষ্ট কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), তখন ১৩ বছর বয়সী হেয়ার স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র, কবিতা লিখে হ্যান্ডবিলে বিতরণ করেছিলেন। মেট্রোপলিটান ইনিস্টটিউশনের শ্যামপুকুর শাখার (৬৩, শ্যামবাজার স্ট্রিটে) ছাত্ররা হ্যান্ডবিল বিলি ছাড়া, পঞ্চম শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণির ২৬ জন ছাত্র এবং পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ছাত্ররা ২৭টি কবিতা ও একটি গানের সংকলন— 'সাগর-শোকোচ্ছ্বাস' ১৮৯১ সাসের ১৫ আগস্ট প্রকাশ করেন। তখনকার প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণি বলতে বর্তমানের দশম থেকে চতুর্থ শ্রেণি বুঝতে হবে।

শুধু কবিতা নয়, তাঁর স্মরণে নাটকও হয়েছিল। স্টার থিয়েটারের নাট্যকার-অভিনেতা অমৃতলাল বসু 'বিলাপ বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন' নামে একটি নাটিকা লিখে মঞ্চস্থ করলেন ৬ ভাদ্র, ১২৯৮ তারিখে। অনতিবিলম্বে ২৬ পাতার পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশ করলেন। আবার রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার শোকসঙ্গীত ও সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামে একটি ১৬ পৃষ্ঠা সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশ করে বিনামুল্যে বিতরণ করে।

মৃত্যুর কয়েকমাস পর ১৮৯১ সালের ২৭ আগস্ট [১১ ভাদ্র, ১২৯৮] কলকাতার টাউনহলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিদ্যাসাগরের স্মরণে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চার বছর বাদে ১৩০২ সালে ১৩ শ্রাবণ এমারেল্ড থিয়েটারে স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিখ্যাত রচনা 'বিদ্যাসাগর-চরিত' পাঠ করেন।

এর চার বছর পরে, অর্থাৎ মৃত্যুর প্রায় আট বছর বাদে, ২৮ মার্চ ১৮৯৯ তারিখে মেমোরিয়াল কমিটির উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের একটি প্রতিকৃতি ও প্রতিমূর্তি প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় কলকাতার সংস্কৃত কলেজে। আট বছর বাদে, (জুন ১৯০৭) মূর্তিটি পাদপীঠসহ কলেজ স্কোয়ারে স্থানান্তরিত হয়। সংস্কৃত কলেজে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে তৎকালীন অধ্যক্ষ এবং মেমোরিয়াল কমিটির সম্পাদক নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংস্কৃত ও বাংলায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কবিতা রচনার অনুরোধ জানান। এই সকল কবিতা এবং নবীনচন্দ্র সেনের লেখা একটি ইংরেজি চিঠিসহ 'বিদ্যাসাগরের—প্রশস্তিঃ' নামে একটি পুস্তিকা পুত্র নারায়ণচন্দ্র প্রকাশ করেন। এটি ১৮৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে 'কেবল বান্ধবমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারার্থ' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৬-এ জেলাশাসক বিনয়রঞ্জন সেনের নেতৃত্বে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ শুরু হয়। ১৯৩৮ সালে (২৪ ভাদ্র ১৩৪৫) জেলাশহরের অরোরা সিনেমা হলে অধ্যাপক স্যার সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে স্মৃতিমন্দিরের

ভিত্তি স্থাপন হয়। ১৩৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর (৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬) রবীন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন করেন। সঙ্গী ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, সজনীকান্ত দাস সহ বহু বিশিষ্টজন।

১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরও বাঙালি অবাঙালি নির্বিশেষে বিদ্বৎসমাজ তাঁকে স্মরণ করছিল। এমন কী আজও তাঁকে নিয়ে লেখা বই মুদ্রিত হয়ে চলেছে। সব জায়গাতেই তিনি প্রভাসিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা শুধু বিদ্যাসাগর হিসাবে। কিন্তু কর্মাটাঁড়ে, তাঁর জীবনের শেষ দুই দশকের কর্মস্থলে, প্রান্তিক জনপদে সেই আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল— আমাদের ঈশ্বর নেই।

বিদ্যাসাগরের পূর্বপরিচিত আত্মজন আবদুল জব্বার ছিলেন সাঁওতাল পরগনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এঁর যোগাযোগ ও সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর ১৮৭২ সালে কর্মাটাঁড়ে জমিবৃক্ষবাগান-সহ একটি ভগ্নবাড়ি কেনেন। কেন কর্মাটাঁড়ে গেলেন? প্রচলিত ধারণা— মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পলায়ন বা ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার বা নিরুপদ্রব অবসর জীবন যাপন। পলায়ন বিদ্যাসাগরের জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না। আর স্বাস্থ্যোদ্ধার বা অবসর জীবন যাপনের জন্য আপামর বাঙালির গন্তব্য ছিল দেওঘর বা মধুপুর। তবে কর্মাটাঁড় কেন? হয়তো এর পিছনে বর্ধমান বাসের একটা ভূমিকা আছে। ১৮২৫ সালে ভয়াবহ বর্ধমান মহামারীর সময় বিদ্যাসাগর ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্রকে নিয়ে বেশ কিছুদিন ত্রাণকার্য করেন। তখন তিনি বর্ধমান মহারাজদের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করে মুসলিম বসতি ঘেরা বাড়িতে থাকতেন, যেখানে জনজাতিদের উপস্থিতি ছিল। সেখানেই হয়ত তিনি আবদুল জব্বারের কাছে ১৮৫৫ সালে সাঁওতালদের হুল বিদ্রোহ এবং তাদের উপর নির্মম অত্যাচারের কথা শোনেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ইংরেজ শাসকরা সাঁওতালদের দমন করার জন্য ১৮৫৬ সালে বীরভূম জেলা ভেঙ্গে সাঁওতাল পরগনা গঠন করেন। যে কারণেই হোক, কর্মাটাঁড়ে তিনি জনজাতিদের মধ্যে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং কলিযুগের নন্দনকানন ও মহর্ষির আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন।

> ''বিদ্যাসাগর এদের মধ্যে নতুন একটা জগৎ খুঁজে পেলেন। তিনি বন্ধু হয়ে গেলেন সেই আদিবাসী মানুষদের।....অশিক্ষিত আদিবাসীদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। খুললেন দাতব্য চিকিৎসালয়। তাদের পরিশ্রমজাত দ্রব্যাদি যা বাজারে বিক্রি হত না, তিনি নিজেই কিনে নিতেন। তারপর আবার বিলিয়ে দিতেন, যারা বেশী দুঃস্থ তাদের মধ্যে। টাকা দান না করে, তিনি তাদের খাটিয়ে নিয়ে টাকা দিতেন। ... বাগানে ঢুকবার দরজার পাশে যে তিনটি ঘর ছিল, সেগুলিতে থাকতো দূরের গ্রাম থেকে আসা রোগীরা।
>
> [সন্তোষকুমার অধিকারী। কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর পৃ. ৬৫]

> ''সাঁওতালরা তাঁহাকে এত ভালবাসিত যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিবার সময়ে, যাহার যাহা থাকিত, তাঁহার জন্য লইয়া আসিত। এক ব্যক্তির কিছু না থাকায় সে একটা মুরগীর ছানা লইয়া আসিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার উপবীত দেখাইয়া বলিলেন, ''আমি ত উহা লইব না।" সে ব্যক্তি মর্ম্মাহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরুপায় হইয়া সেই কুক্কুটশাবক হাতে করিয়া লইলে পর সে ব্যক্তির মনঃক্লেশ দূর হইল।
>
> [বিদ্যাসাগর। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৩৫৫]

যে মানুষটি বর্ধমান রাজপরিবারের রাজ-আতিথ্য, ব্রাহ্মণত্বের সম্মানদক্ষিণা দেওয়ার রাজ-সংস্কার, বীরসিংহ গ্রামের পত্তনি দেবার প্রস্তাব সবকিছু হেলায় প্রত্যাখ্যান করেন তিনিই কর্মাটাঁড়ে পড়শীদের দেওয়া উপহার সানন্দে

গ্রহণ করছেন। পইতাধারী গ্রহীতা মুরগী হাতে নিয়ে হাসছেন, পরশী-দাতারাও হাসছেন। তাঁর ঘরে নারীরা নিঃসংকোচে ঢুকে বলছে— ঈশ্বর খেতে দে। ঈশ্বর কাপড় দে। ঈশ্বরচন্দ্র চন্দ্র বিহীন হয়ে শুধু ঈশ্বর হয়ে উঠলেন। মহাভারতের যুগ থেকে আজ অবধি ভারতের জনজাতি অর্থাৎ আদিবাসীরা সবাই বর্বর, অসভ্য, হিংস্র-খুনি। রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ গঠনের জন্য আদিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করে খাণ্ডব বন দহন করা হয়। তার জন্য অবশ্য খাণ্ডব দহনের অব্যবহিত আগে অগ্নিদেবের কাছ থেকে অর্জুন গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীর এবং শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র উপহার পান। এই ট্র্যাডিশন আজও চলছে। বিদ্যাসাগরই প্রথম ব্যক্তি যিনি আদিবাসীদের প্রাণের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। শুধু তাই নয় সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শ্রমকে মূল্য দিয়ে তিনি তাদের সহ-নাগরিকের মর্যাদা দিয়েছিলেন। এটা রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছিল। ১৮৯৩ সালে তিনি কর্মাটাঁড়ে গিয়ে নন্দনকানন ও মহর্ষির আশ্রম দেখেছিলেন এবং শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

কর্মাটাঁড়ে ঈশ্বরচন্দ্র প্রান্তজনপদবাসীদের ভূমির অধিকার ও শ্রমের মূল্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই কাজে ধর্ম ও ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র থেকে ঈশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর একমাত্র কর্মাটাঁড়েই সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল— আমাদের ঈশ্বর নেই।

তথ্যঋণ

(১) বিদ্যাসাগর। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকৃতি, ২০২০

(২) বিদ্যাসাগর। বিহারীলাল সরকার। ওরিয়েন্ট, ১৯৮৬

(৩) কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর। ডাঃ প্রশান্ত কুমার মল্লিক।

(৪) বিদ্যাসাগর। কমলেন্দু ধর। করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০২৩

(৫) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। ১২৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৪২৬। জানুয়ারি ২০২২

সিমলা পাহাড়

অভীক বসু

সিমলা পাহাড় একটু দূরে
চলছে গাড়ি গানের সুরে
পাইন চিনার ঝাউয়ের সারি
পাহাড় তলে ছুটির বাড়ি
বরফ ঢাকা শহর জুড়ে
খেলছে কিশোর বরফ ছুড়ে
কেনাকাটি করতে গেলে
ম্যালে বেড়ান দুচোখ মেলে
উঠতে গেলে হাঁটুর ব্যথা
লিফট রয়েছে তাইতো সেথা
পাহাড় চূড়ায় কালীবাড়ি
বঙ্গভাবা শুনতে পারি
পুজোর সময় ভোগ বিতরণ
ভক্তিভরে তাইতো গ্রহণ
ঝুলছে আপেল হাজার গাছে
হাত দিওনা ভুলেও পাছে
আপেল পাড়ায় আইন কড়া
মোটা ফাইন পরলে ধরা
টয় ট্রেনেতে চাপতে হবে
কালকা থেকে সিমলা তবে
চোখ জুড়ানো দৃশ্য পাবে
সবুজ আপেল চিবিয়ে খাবে
বাড়তি সময় থাকলে হাতে
কুর্ফি ফাগু থাকুক সাথে
স্কীইং করা ঘুরতে এসে
দারুন খেলা বরফ দেশে
সূর্য এখন অস্তগামী
পাহাড় চূড়ায় একলা আমি
সাঙ্গ হল ঘোরার পালা
খুলতে হবে ঘরের তালা।

বার্ধক্যে সুখে থাকা

অশোক রঞ্জন ধর

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সুদীর্ঘকাল ধরে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা এক অনবদ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করে এসেছে। পরিবারের প্রাচীনতম পুরুষটি অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে এসেছে। কোনও কারণে তিনি অপারগ হলে স্বেচ্ছায় জ্যেষ্ঠপুত্রকে এই দায়িত্ব অর্পণ করতেন। এতে তার অবস্থার পরিবর্তন হত না। সামাজিক প্রধান হিসেবে তিনিই থাকতেন।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের গোড়া থেকে শিল্পায়ন, নগরায়ন, আধুনিকীকরণ, শিক্ষার প্রসার, বৃত্তির জন্য বাসস্থান ছেড়ে দূরদেশে যাওয়া, নারীদের অবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তন শুরু হলেও কেন্দ্রীয় অভিমুখ ছিল যৌথ-পরিবার ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে।

এভাবে চলতে চলতে ক্রমে যৌথ-পরিবার ব্যবস্থা দ্রুত বিলুপ্তির পথে। গ্রামাঞ্চলে কিছু টিকে আছে। শুরু হয়েছে অণু পরিবারের। স্বাভাবিকভাবেই বয়স্কদের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটছে দ্রুতগতিতে। অবস্থা আর বয়স্কদের অনুকূলে থাকছে না।

মানুষের জীবনে বার্ধক্য অবশ্যম্ভাবী, সেই সঙ্গে আসবে জরা, ব্যাধি। জীবনের শেষ পর্য্যায়টি সুস্থ-সুন্দর ও নিরুদ্বেগে কাটাতে ও আত্মমর্য্যাদা নিয়ে বাঁচতে কতকগুলি বিষয়ে নজর দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি নিয়ে এখানে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

(ক) টাকা হাতে রাখুন

১। জীবনের একসময় অবসর নিতেই হবে। সেজন্য অবসর গ্রহণের ৫/৭ বৎসর পূর্বেই ভবিষ্যৎ জীবনের একটি পরিকল্পনা করে রাখতে হয়।

২। সঞ্চয় করুন। সঞ্চয়ের টাকায় হাত দেবেন না।

৩। হাতে টাকা না রেখে ছেলেমেয়ে বা অন্যের মুখ চেয়ে বসে থাকবেন না। তাদের রোজগার বেশি নাও হতে পারে। ক্রমাগত হাত পাতলে আপনজনও বিমুখ হয়।

৪। কাজের লোক, অসুখ বিসুখের জন্য টাকা রাখুন।

৫। নিজের সাধ আহ্লাদ মেটান। নাতি-নাতনিদের আবদার মেটাতে চেষ্টা করুন।

৬। সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারে নিয়মিতভাবে অর্থ দিন।

৭। বাজেট করে চলুন। হাতে টাকা থাকলেই কনফিডেন্স আসে।

৮। কৃপণতা করবেন না। টাকার চেয়ে মানুষ বড়ো।

(খ) শরীর সুস্থ / ফিট রাখুন

১। স্বাস্থ্যই সম্পদ। সময় থাকতে শরীরের যত্ন নিন। সাধ্যমতো পরিশ্রম করুন। রোজ হাঁটুন, হালকা ব্যায়াম করুন।

২। শরীরের কষ্টভোগ আপনার, কেউ ভাগ নিতে পারবে না। অসুখ মানেই বন্দী জীবন ও খরচ। অসুস্থ বৃদ্ধ মানুষকে নিয়ে আপনজনেরাও একসময় বিরক্ত হয়ে ওঠে।

৩। ডায়েট চার্ট মেনে চলুন। লোভ সংবরণ করুন।

৪। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আপনার সমস্যা নিয়ে কথা বলুন।

(গ) নিজেকে ব্যস্ত রাখুন

১। বৃদ্ধ বয়সে "অলস মস্তিষ্ক দুশ্চিন্তার কারখানা"। কাজ করলে সময় কেটে যাবে, নিজেকে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান মনে হবে।

২। ঘর-সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকুন। কে, কবে কাজ দেবে তার অপেক্ষায় থাকবেন না।

৩। নিজেকে সৃষ্টিশীল, সেবামূলক ও সৎ কাজের সঙ্গে রাখুন।

৪। মাঝে মাঝে আলোচনা সভা, ধর্মসভা, আড্ডায় যোগ দিলে ভালো লাগবে।

৫। কোনও একটি হবি ধরে রাখুন। যেমন বাগান করা, মাছ ধরা, ছবি আঁকা, বই পড়া ইত্যাদি।

৬। মনকে সতেজ রাখতে কোনও একটি অজানা বিষয় শেখার জন্য ভর্তি হতে পারেন।

৭। নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠতে হবে। পাড়ায়, পার্কে, প্রতিবেশির সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়তে হবে। পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন-কম্পিউটারের সাহায্য নিতে পারেন।

(ঘ) বেশি কথা বলবেন না ও খিটখিট করবেন না

১। বেশি কথা বললে গুরুত্ব কমে যায়। বকবক করলে কেউ আপনার ধারে কাছে আসতে চাইবে না। কথা কম বলে শোনা অভ্যাস করুন।

২। খিটখিট করা শরীর ও মনের পক্ষে ক্ষতিকর।

৩। খিটখিটে লোককে কেউ পছন্দ করে না ও তার গুরুত্ব কমে যায়।

৪। খিটখিট না করে সমস্যার সমাধ্যান করুন। গৃহশান্তি বজায় রাখুন।

(ঙ) বুড়িয়ে যাবেন না

১। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুন। সে যুগের আদর্শ এ যুগে অনেকটাই অচল। এ যুগের নিন্দা না করাই ভালো।

২। মিথ্যে বলবেন না। বাড়িয়ে বলবেন না।

৩। বুড়ো হওয়ার আগে বুড়ো হবেন না। নিজেকে বুড়ো ভাবলেই বুড়ো, না ভাবলেই নয়। বয়স হওয়া আর বৃদ্ধ হওয়া এক জিনিস নয়।

৪। মনকে প্রস্তুত করুন। বাস্তববাদী হোন।

(চ) স্বাবলম্বী হোন

১। স্বাবলম্বী হলে কর্তৃত্ব করতে পারবেন, স্বাধীন থাকবেন।

২। নির্ভরতা ক্ষতি করে। সব ব্যাপারে নির্ভরশীল হলে লোকে বিরক্ত হয়।

(ছ) বার্ধক্য উপভোগ করুন

১। রোজ রাতে সারাদিনের কথা মনে করুন। ডায়েরি লিখুন।

২। জীবনের স্বাদ নিন— মানানসই পোষাক পরুন।

৩। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন।

৪। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা/ধর্মগ্রন্থ রোজ পাঠ করুন।

৫। সব ভাল যার শেষ ভাল।

পরিশেষে সমাজের বৃহত্তের কল্যাণে বার্ধক্যের নিঃসঙ্গতা, অবহেলা ও অন্য জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে তিন প্রজন্মের মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। একটা সুন্দর পৃথিবী তৈরি করতে হবে। যেখানে পরিবারের সকল সদস্যই বয়স নির্বিশেষে সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে ও পরিশেষে পরম শান্তিতে আত্মমর্যাদা নিয়ে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা

তপন কুমার দাস

বিপুল ও বিচিত্র পথগামী রবীন্দ্র প্রতিভার তুলনা নেই। আবার কবি বলেছেন যে, বিপুলা এই পৃথিবীতে কতটুকু জানি। তিনি বহুক্ষেত্রে নিজের সমালোচনা নিজেই করতেন। তাঁর থেকে শেখার শেষ নেই। আমরা বলতে পারি সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই, যা নব নব উন্মেষকালিনী রবীন্দ্র প্রতিভার স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি।

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কবি ও শিল্পী ছিলেন না— চিন্তার জগতেও তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। যা রাশিয়ার চিঠি পড়লে আরও ভালোভাবে জানা যায়। বলা যায় যেমনভাবে ঈশ্বর, প্রকৃতি, ধর্ম, স্বদেশ ও সমাজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা গভীর মূল্য বহন করে।

সাধারণভাবে কবি, সাহিত্য নিয়ে বহু আলোচনা বা বহু বই প্রকাশ হয়েছে। তিনি কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক মানুষও ছিলেন। আবার চিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রমনীষা প্রায় সর্বব্যাপী। আধুনিক জীবনের সব শাখাতেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সুদূর প্রসারী। আধুনিক জীবনের একটি বড়ো দিক স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশ চিন্তা। কারণ মানুষ যে দেশে, যে পরিবেশে ও যে কালে জন্মগ্রহণ করেন মূলতঃ তাকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবনসাধনা তথা চিন্তাধারা বিকাশ হতে থাকে। স্বদেশের জীবন্ত পটভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে আধুনিক মানুষের জীবনবিকাশ সম্ভব হতে পারে না। তাই কোনো বড়ো প্রতিভা তাঁর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও স্বভাবতঃ লৌকিক।

দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয়, তবেই দেশ প্রকাশিত। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষের তৈরি। তাই দেশ নিজের সত্তা প্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোনও সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে, কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে মরুবালু তলে ভূমির মতো। কবি বুঝতেন প্রকৃতি যেমন দরকার ঠিক তেমনভাবেই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তানও দরকার। একে অপরের পরিপূরক।

রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে দেশ নিজেকে কিভাবে লাভ করেছে তা জানতে হলে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার সামগ্রিক রূপটি আমাদের জানতে হবে। এই বিষয় নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য অনেক লেখক বন্ধু ছোটো বড়ো প্রবন্ধে ও বইয়ে এক দিকটির উপর অল্পবিস্তর

আলোকপাত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে শ্রী নেপাল মজুমদারের "ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ও বিশ্বের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার দিকটি অভিব্যক্ত। স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশচিন্তা মানুষের সহজাত ও অতি স্বাভাবিক এক মহৎ বৃত্তি। বিশেষ করে অত্যাচারী বিদেশি শাসকাধীন দেশে মানুষের চিন্তায়, কর্মে অতিশয় ব্যাপক, গতিময় ও ক্রিয়াশীল। পরাধীন ভারতবর্ষে ইতিহাসের এক পর্ব থেকে আর এক পর্বের যুগসন্ধি পর্যন্ত সুদীর্ঘ আশি বৎসরকাল রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ জীবনের ব্যাপ্তি। এই সময়ের মধ্যে স্বদেশে বহু জটিল পরিস্থিতি ও সমস্যার উদ্ভব হয়ছে— বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আধুনিক ভারতের সমস্যা সমূহের সমাধানকল্পে রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত অনেক চিন্তা করেছেন। যা আমাদের স্বাদেশিকতার ইতিহাসকে উজ্জ্বল বর্ণে চিহ্নিত করে রেখেছে। দেশবাসীর সুখ দুঃখের সঙ্গে তাঁর নিজের সুখ দুঃখ একসূত্রে বন্ধন করেছেন। দেশের করুণ ও কঠোর সকল অবস্থায়ই তাঁর চিত্ত অল্প বিস্তর দোলায়িত হয়েছে। তিনি স্বদেশবাসীর নিকট নিত্য নূতন চিন্তা ও আশা ভরসার বাণী উপস্থাপিত করেছেন। চিন্তা, কর্ম-সৃষ্টি— এই তিন ক্ষেত্রে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন মনুষ্যত্বের বিকাশ ও পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য। বিচিত্রমুখী জ্ঞানে, কর্মে, সৃষ্টিতে স্বদেশকে সমৃদ্ধ ও প্রকাশবান করে তোলার জন্য তিনি আজীবন নিরলস সাধনা করে গেছেন। দেশের জন্য কবির ভাবনা কেবলমাত্র কবিতায় অনুভূতির মধ্যে কিংবা প্রবন্ধে বিশুদ্ধ চিন্তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েই নিরস্ত হয়নি। কবি তাঁর চিন্তাধারাকে বাস্তবে বিশিষ্ট রূপ দিতেও চেষ্টা করেছেন। বিরাট পরিকল্পনার কর্মকে বাস্তবে কঠিন পরিশ্রম করতে কখনোই পিছপা হননি।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা তাঁর জীবনদর্শন তথা জীবন সাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে এককথায় বলা যেতে পারে মানুষের ধর্ম— যেখানে মানুষ নিত্য গতিশীল জীবনসাধনার মধ্য দিয়ে দেশকালের সীমানা অতিক্রম করে এক পরম আদর্শগত অখণ্ড তাৎপর্যময় সার্বভৌম মনুষ্য বিকাশের পথে অগ্রসরমান।

মানুষ আছে তার দুই ভাব নিয়ে, একটা তার জীবনভাব, আর একটা বিশ্বভাব। জীবন আছে আপন উপস্থিতি আঁকড়ে, জীব চলেছে আস্ত প্রয়োজনের কেন্দ্র অতিক্রম করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এ আদর্শ একটি আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন দিকে নির্দেশ? যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব।

তাই দেশ নিজের সত্তা-প্রমাণের খাতিরেই দিবারাত্র তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোনও সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে, কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে মরুবালু তলে ভূমির মতো।

এই কারণেই দেশ যার মধ্যে আপন ভাষার প্রকাশ অনুভব করে তাকে সর্বজন সমক্ষে নিজের বলে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ রচনা করতে চায়। যেদিন তাই করে সেদিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম।

রবীন্দ্রপূর্বযুগে বহু মনীষীর চিন্তায়, কাব্যে, নাটকে, ধর্মান্দোলনে ও কর্মচেষ্টার মধ্য দিয়ে স্বাদেশিকতার যে আদর্শ গড়ে উঠেছিল— যুগধর্মের সেই মশাল থেকেই কবি তাঁর প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়েছেন এবং উত্তরোত্তর তা স্বকীয় প্রতিভার বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে চিরকালের রঙমশালের ন্যায় দেদীপ্যমান।

মুসলিম পরব 'শবেবরাত' (শব-এ-বরাত)

গাজী মহম্মদ আবুবকর

সারা পৃথিবীর একশ নব্বই কোটি মুসলিম এবছর মার্চ মাসের সাত তারিখে পালন করছেন শবেবরাত। ইসলামী আচার অনুষ্ঠানের জন্য অনুসরণ করা হয় হিজরী ক্যালেন্ডার। হিজরী সালেও আছে আলাদা আলাদা বারোটি মাস। তার মধ্যে 'শাবান' নামের মাসটি অষ্টম।

প্রত্যেক মাসের শুরু হয় চাঁদের অবস্থান হিসাবে অমাবস্যার পর থেকে পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত একমাস। শবেবরাত পালিত হয় 'শাবান' মাসের সন্ধ্যা থেকে, যখন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ধরণীর রূপ হয়ে ওঠে ঝলমলে। মুসলিমদের প্রধান দুটি পরব হলো ঈদ (ঈদ-উল-ফিতর) আর বকরা ঈদ বা বকরীদ (ঈদ-উজ-জোহা)। শবেবরাতও একটি মুসলিম পরব। হাদীস অনুসারে মহানবী হজরত মুহাম্মদ আল্লাহর নির্দেশে জান্নাত-উল-বকত দর্শন করেছিলেন। আর একটি হাদিস অনুসারে, মহানবীর একটি দাঁত পড়ে যাবার জন্য এই দিনে তিনি নরম হালুয়া ভক্ষণ করেছিলেন। মুসলিম সমাজে শবেবরাত পরবে সুমিষ্ট আর স্বাদালু মিষ্টান্ন হিসেবে বহু প্রকারের হালুয়া তৈরির যে প্রথা আছে তার পেছনে এটি একটি কারণ হতে পারে। অন্য একটি ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের মত হলো, মহানবী হজরত মুহাম্মদের পিতৃব্য আমীর হামজা এই দিনে শহীদ হয়েছিলেন। আরও একটি ধর্মীয় বিশ্বাস আছে তা হলো মৃত ব্যক্তির রুহরা (আত্মারা) ওই দিনে তাদের বাসস্থান দেখতে আসেন যে তাদের জন্য বিশেষ কোনো সুখাদ্য তৈরি করা হয়েছে কিনা। অন্য একটি বিশ্বাস মতে বলা হয়েছে, যদি কেউ শবেবরাতের আগে এন্তেকাল করে থাকেন তবে সেই রুহর নাম তালিকায় উঠবে না যদি তার নামে শবেবরাতের ফাতেহা পাঠ না করা হয়ে থাকে। এই সব ধর্মবিশ্বাস নিয়ে হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে। Spiritual দিক থেকে শবেবরাত হলো প্রার্থনার দিন। মুসলিমদের প্রত্যেক দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাঠ ছাড়াও ওই বিশেষ দিনে পড়তে হয় 'নফল নামাজ'।

শবেবরাত উপলক্ষে বাচ্চাকাচ্চারা আতসবাজি নিয়ে খেলা করে, মাতামাতি করে। ওই দিনে ঘরে আলো দিয়ে সাজানো হয়। কবরস্থানে ধূপ বাতি জ্বালানো হয়, পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। মুসলিমদের মধ্যে নানা পন্থী মতামত। অনেকে এসবকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমোদন করেন না। তবে ঘরে ঘরে হালুয়া রুটি মিষ্টান্ন তৈরি হয় ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী। সেসব সুখাদ্য আবার আত্মীয় স্বজনদের ঘরে পাঠানোর প্রথা আছে। গরীব মিসকিনদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। শবেবরাতের রাতে নামাজ পাঠ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয় রাতভর। ধর্মীয় বিশ্বাস মতে, এই দিন গুনাহের (পাপের) ও সওয়াবের (পুণ্যের) পরিমাপ হয় রুহের (আত্মার)। কার কবে জন্ম হবে বা মওত (মৃত্যু) হবে তারও খতিয়ান তৈরি হয়। কর্মফল অনুসারে সুখ ও দুঃখ বাটোয়ারা হয় ওই দিন। শবেবরাতের রাত্রিকে মনে করা হয় আত্মবীক্ষণের রাত্রি। পূর্বপুরুষদের স্মরণ করা হয় ওই দিন। তাদের উদ্দেশে ফতেহা পাঠ করা হয়। বহু মানুষ আত্মীয়স্বজনদের কবরস্থানে গিয়ে তাদের কবর জিয়ারত করেন। ইসলামের মূল নীতিগুলি এক হলেও দেশেদেশে ও কালেকালে লোকাচার ও নিয়মনীতির কিছু কিছু বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। মুসলিমদের মধ্যে শিয়াসুন্নী, পীরপন্থী, তবলিগ জামাত ইত্যাদি ভাগ আছে। ধর্মীয় বিশ্বাস আচার আচরণ নিয়ে সকলের ব্যাখ্যা একরকম নয়। সুতরাং, ইসলাম ধর্মীয় মূল আদর্শ ও মূল্যবোধ একই— এটাই শেষ কথা।

(তথ্য সংগ্রহ : মূলত Dr. Mazda Asad -এর Indian Muslim Festivals & Customs. Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting. Govt of India, 1988)

Vol : XII Issue : XII, 15th March, 2023, PRABINBARTA (RNI NO - WBBEN/2012/46375)

পরম পবিত্র তীর্থ হিমাচলের মণিকরণে কিছুক্ষণ

(২য় পর্ব)

সমীর কুমার ঘোষ

অশোকের সঙ্গে মালানা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে করতে কখন যে ৮ কিমি পথ পেরিয়ে কাসোল পৌচেছি খেয়াল করিনি। পথে সুসজ্জিত বিদেশি সম্ভারে ভরা দোকান দেখে চমকে উঠি। কুলু বা মানালি শহর থেকে এ্যাত দূরে বিদেশি পোশাক-আশাকে সাজানো দোকান সত্যিই অবাক করে দেয়। রাস্তার মোড়ে চোখ পড়ল স্বল্পবাস পরিহিত কয়েকজন বিদেশিনী হাসতে হাসতে কোথায় চলেছেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম এখানে হিপীদের সমাজ গড়ে উঠেছে। বলা যায় তাদের স্বর্গ রাজ্য। মাদক সামগ্রী অত্যন্ত সহজলভ্য এখানে। চরস, গাঁজা ইত্যাদির উৎপাদন হচ্ছে এদিককার বিভিন্ন গ্রামে। তাই সুদূর অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের নানা জায়গা থেকে ওরা এসে ভিড় জমাচ্ছেন কাসোলে। পথের ডানদিকে পাইনে ছাওয়া পাহাড়, বাঁয়ে উচ্ছ্বসিতা পার্বতী, সামনে হিমতীর্থ হিমাচল। মাথার ওপর নীলাকাশ। যেন সুনীল চন্দ্রাতপ। তার বুকে ভেসে বেড়চ্ছে ছোট ছোট মেঘ। তারই প্রতিবিম্ব ধরা পড়ছে সদা চঞ্চলা পার্বতীর বুকে।

নয়নলোভন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে মাত্র ৪ কিমি পথ পার হয়ে মণিকরণ বাস স্ট্যান্ডে এসে বাস থামল। বাস থেকে নেমে বড়ো রাস্তা ধরে এগিয়ে চলি। অল্প পথ। রাস্তার ডাইনে পাইন বনে ছাওয়া সবুজ পাহাড় আর বাঁয়ে বয়ে যাচ্ছে পার্বতী গঙ্গা। মূল জনপদ পার্বতী নদীর উত্তর তীরে আর দক্ষিণে বাস স্ট্যান্ড, বাজার— সেতুতে পারাপার। সেতুতে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করি এখানে আকাশ নীরব, পাহাড় নীরব, নীরব দুপাশের সবুজ বন। এই বিশাল নীরবতার মাঝে নাগাড়ে কথা বলে চলেছে কলস্বনা পার্বতী। কথাতো নয়, যেন গান— মিষ্টি মধুর সুরেলা গান— যেন সুরালয়ের জয়গান।

পুরাণে মেলে, স্বর্গের দেব-দেবীদের বিহার স্থল কুলিঙ্গ পীঠ অর্থাৎ মণিকরণ তীর্থ। মণিকরণকে ঘিরে একটি পৌরাণিক আখ্যানও আছে। হর-পার্বতী এসেছিলেন মণিকরণে। বেশ আনন্দেই তাঁদের দিন কাটছিল। তাঁরা একদিন বেড়াতে বেড়িয়ে হঠাৎ দেবী পার্বতী খেয়াল করলেন তাঁর কানের দুষ্প্রাপ্য মণিকুন্তলটি কানে নেই। অনেক খোঁজা খুঁজি করেও তা পাওয়া গেল না। আর তা পাওয়া যাবেই বা কেমন করে? পার্বতীর কান থেকে দুষ্প্রাপ্য কর্ণমণিটি পড়া মাত্রই শেষনাগের নজরে আসে। তিনি কালবিলম্ব না করে স্বর্গের অমূল্য রত্নটি নিয়ে পাতালে চলে যান। এদিকে পার্বতীর আকুলতায় মহাদেব ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। অতঃপর তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেটি ফিরে পাবার জন্য কঠিন তপস্যায় বসেন। কেঁপে ওঠে ব্রহ্মাণ্ড। শিবের তৃতীয় নয়ন থেকে সৃষ্ট নায়নাদেবী পাতালে যান অমূল্য মণিকুন্তলটির খোঁজে। পাতালে শেষনাগ

দেখলেন মহাবিপদ, তিনি ধরা পড়ে গেছেন। তাই তাড়াতাড়ি পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসেন মণিকুন্তলটি নিয়ে, আর সঙ্গে আনেন আরও নানান মণি-রত্ন, শিবকে তুষ্ট করতে। শেষনাগ পাতাল থেকে উঠে আসার সময় উষ্ণধারা প্রস্রবণ হয়ে মর্ত্যলোকে প্রবাহিত হতে থাকে। তপস্বী শিব পার্বতীর কুন্তলটি রেখে বাকি মণিগুলিকে পাথরে রূপান্তরিত করে রেখে দেন প্রস্রবণ অভ্যন্তরে। সেই থেকেই এর নাম মণিকরণ। এদিকে হারানো মণিকুন্তলটি ফিরে পেয়ে উচ্ছল হয়ে উঠলেন দেবী পার্বতী। শান্ত হলেন শিব শম্ভু। ত্রিভুবন রক্ষা পেল। মণিকনিকা নিয়ে হর-পার্বতী ফিরে গেলেন কৈলাশে। নাগলোকের সেই উষ্ণধারা আজও উঠে আসছে মর্ত্যলোকে এবং বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে গরম জলের প্রস্রবণ হল মণিকরণ।

গুরু নানক তাঁর শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে মান্ডি হয়ে সুমেরু পর্বত যাচ্ছিলেন সেই ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে। তখন তিনি আসেন এখানে এবং থাকেন কয়েকদিন। সে সময় পাথর সরিয়ে উষ্ণ প্রস্রবণকে নতুন করে আবিষ্কার করেন বলেই বিশ্বাস করেন কেউ কেউ। এরপর গুরু গোবিন্দ সিং-ও শিষ্যসহ আসেন এখানে। তাই মণিকরণ হিন্দুতীর্থ হলেও শিখদের কাছেও অতি পবিত্রভূমি। উষ্ণকুণ্ডের পাশে গুরুদ্বার তৈরি হয়েছে। চলছে গ্রন্থসাহিব থেকে অখণ্ড পাঠ। অতিথি সৎকারের ব্যবস্থাও রয়েছে। চমৎকার থাকা ও লঙ্গরখানায় আহার পরিবেশন চলে সারাদিন।

মণিকরণে (৫,৭০০ ফুট) উষ্ণকুণ্ডের পাশে তথা পার্বতী গঙ্গার তীরে রয়েছে মূল মন্দির। অধিষ্ঠান করছেন শিব-পার্বতী। মন্দিরটি ছোট দোতলা, পাথরের তৈরি। মন্দির শীর্ষে রয়েছে ত্রিশূল আর পত্‌পত্‌ করে উড়ছে গৈরিক পতাকা। মন্দিরের দোতলার চারদিকের দেয়াল কাঁচ দিয়ে ঘেরা। অধিষ্ঠান করছেন শ্বেতপাথরের ভগবান বিষ্ণুমূর্তি। নিচের তলায় শিবলিঙ্গ। পিতলের ঝারি থেকে সদা সর্বদা ফোটা ফোটা জল পড়ছে দেবাদিদেবের মাথায়। উষ্ণকুণ্ডের উষ্ণতার প্রভাবে মন্দির চত্বরের পাথুরে মেঝে সারাক্ষণ উত্তপ্ত হয়ে থাকে। খালি পায়ে হাঁটা যায় না। তাই সর্বত্র কাঠের পাটাতন পাতা রয়েছে। এর উপর দিয়েই সকল যাত্রী যাতায়াত করেন। উষ্ণকুণ্ডের উষ্ণতার প্রভাবে গুরুদ্বারের এক তলার কয়েকটি পাথরের দেয়াল সর্বক্ষণ উত্তপ্ত হয়ে থাকে এবং এখানেই একটি মাত্র ছোট দরজা, জানলা বিহীন ছোট ঘর রয়েছে সেটা সনা (Sauna) বাথ-এর জন্য প্রসিদ্ধ। এছাড়া মণিকরণ গ্রামে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দির যার মধ্যে অন্যতম হল রঘুনাথজীর রামমন্দির। গ্রামবাসীরা বলেন প্রাচীন মন্দিরটি প্রায় তিন হাজার বছরের পুরানো, পাণ্ডবদের তৈরি। এছাড়া রয়েছে হনুমান মন্দির, নয়নাদেবী মন্দির ও শ্রীকৃষ্ণ মন্দির। মণিকরণে রাম মন্দির ধর্মশালাটিও বেশ বড়ো। এখানে থাকা ও খাওয়া মেলে তবে নিখরচায় নয়।

বিশ্বাস কলিযুগের শেষে ও সত্যযুগের শুরুতে ভগবান স্বয়ং প্রকট হবেন এই পরম পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রে। সে দিক দিয়ে বিচার করে বলা যায় মণিকরণ দর্শনে সকল তীর্থ দর্শনের ফল লাভ হয়। বলা যায় সকল তীর্থের সেরা তীর্থ হল মণিকরণ।

---

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

প্রতিবেদক - স্নেহাংশু চাকদার

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মঙ্গলবার বিকেল ৪.০০ টায় রক্তকরবী ব্যালে ট্রুপ এর প্রারম্ভিক সঙ্গীতের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পেলব মুখার্জী। সভাপতি সংস্থার কাজকর্ম সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। তিনি বলেন প্রয়াত সহ-সভাপতি রামরমণ ভট্টাচার্য বেথুনের সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ আমরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য খাতা, কলম, পেন্সিল, ব্যাগ ইত্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা করেছি। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেন সহ-সভাপতি গৌতম রায়চৌধুরীকে। সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালক গৌতম রায়চৌধুরী বলেন বহুদিন ধরেই আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে আসছি। কিন্তু এবছর নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এবছর আমরা প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের খাতা, কলম, পেন্সিল, রংপেন্সিল, ইরেজার ইত্যাদি সহ ব্যাগ বিতরণের ব্যবস্থা করেছি।

দাশনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাণীসদন প্রাথমিক বিদ্যালয় (গোবিন্দপুর) এবং মোল্লাহাটি, বিশ্বাসপাড়া ও যোধপুর গার্ডেন এর প্রায় শত ছাত্রছাত্রীদের পাঠসামগ্রী বিতরণ করা হয়। দাশনগর বিদ্যালয়কে একটি দেওয়াল ঘড়ি ও কয়েকটি ডাস্টার ইত্যাদি প্রদান করা হয়। দাশনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা পারমিতা সাহা বেথুনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন এই সকল খাতা-পেন্সিল-ব্যাগের জন্য তাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রভূত উপকার হবে। অর্থের অভাবে এদের অভিভাবকদের পক্ষে যথেষ্ট পাঠসামগ্রী কিনে দেওয়া সম্ভব হয় না। বাণীসদন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্র সিং জানান তদের স্কুলে হিন্দিভাষী গরীব ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। এই সামান্য দান তাদের অসামান্য উপকার করবে। প্রত্যুত্তরে আমাদের সহ-সভাপতি গৌতম রায়চৌধুরী বলেন, তাঁরা একাধারে মহৎ কাজে ব্রতী শিক্ষক এবং সংগ্রামী বিপ্লবী। পশ্চিমবঙ্গে যখন দুর্নীতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত তখন তারা সামান্য পারিশ্রমিকে শিক্ষা প্রসারে নিমগ্ন থেকে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁরা আমাদের নমস্য। তিনি ভবিষ্যতেও তাদের সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। এর পর শুরু হয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিভিন্ন দিক ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন চন্দ্রিমা রায়, অমল কর, মৃণাল দত্ত ও গাজী মহম্মদ আবুবকর। পরবর্তীতে শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। প্রথমে দুই শিশু শিল্পী আন্তরিক গুহ ও আত্মজা গুহ তাদের গানের মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। পরবর্তীতে গৌতম বসু রায়চৌধুরী (গড়িয়া), দীপান্বিতা দত্ত ও গৌতম রায়চৌধুরীদের (সন্তোষপুর) সঙ্গীতে দর্শকরা মোহিত হন।

সহ-সভাপতি গৌতম রায়চৌধুরী আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন এবং সমগ্র অনষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

Vol : XII Issue : XII, 15th March, 2023, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2022-24

গরিমাহীন কবি

অমল কর

যা শব্দ প্রসব দিলে এ-যাবৎ
মনের পাতায় সুপ্ত অবুঝ কাঙ্ক্ষায়
ভুবনায়নের উড়ুক্কু রঙিন ডানায়
ব্যাঙাচির মতো এ-দল থেকে ও-দলে
মনুষ্যত্ব-বিবেক বেচে
প্রবল ক্ষমতায় চাইলে
দ্যাখো, গেঁজে ওঠছে বিজবিজ
গা-বমি বিবমিষা

বিব্রত হবে এমন কোনো
উজবুক নও তুমি
শুয়োরের উৎসবে তুমি পুটপুট
পোষা অন্ধকার
অগ্রসর সময়ে, নির্ভয়ে,
লোভী তুমি, কবি—
কবি? কতটুকু কবি তুমি?
ব্যক্তিত্বরহিত আত্মগরিমাহীন।

তলপেট টনটন করছে
ক্রমাগত ঘৃণা জমে জমে
কিলবিল কীট দেখলে
বেহায়া উপেক্ষা আসে নেমে।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভায ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভায-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা
১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা
৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বিকেল ৫টা
৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) সন্ধে ৭টা
৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in